PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine during prolonged Nationwide Lockdown. Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. Mob: 9433284720

দ্বাদশ অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই চৈত্র, ১৪২৭ / 24.03.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
রামদাস কাঠিয়াবাবার অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
সম্প্রীতির নিলয় প্রীতিকুমার	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ
অন্তিম শয্যায় মা সারদা	প্রণব ঘোষ
স্বাগত শুভ নববর্ষ ১৪২৮	শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র
বাঁধিও মোরে চরণডোরে	স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ
প্রত্যর্পণ	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

"আমি আজ সমস্ত অতীতকে ভুলে যেতে চাইছি। শুধু ততটুকু থাক আমার সাথে যা ভবিষ্যত জীবনকে গড়বার পক্ষে সহায়তা করবে। সমস্ত অতীতই আমার জীবনে মধুময় ও প্রেমময়। এই অতীতই আজ আমাকে এখানে ও বর্তমান জীবনে পৌঁছে দিয়েছে। অতীত হয়তো কোথাও নিষ্ঠুর হয়েছে, কিন্তু সে দিয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান ও বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য। যেখানে হৃদয়ের তিক্ততা পেয়েছি, তারই মাঝে এসেছে শাশ্বত স্পন্দন। যেখানে কঠোর বেদনা ঠিক সেইখানেই পেয়েছি করুণাময়ীর অপার স্নেহ। সকলে হয়তো ছেড়েছে আমাকে, – ছাড়েনি মা, ছাড়েনি রাধা। স্নেহ মমতার শক্তি বল, প্রেম ভালবাসার গভীর বন্ধন, – সব কিছুই শাশ্বত।"

———————————

শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে গৃহীত। রচনাকাল ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৬ ।

স্মৃতিচারণ

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

পার্থসারথিতে লেখবার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই। কিন্তু শ্রী প্রীতিকুমারকে এতো কাছের থেকে শেষের দিকে কে আর দেখেছে? তাঁর অল্প বয়সের ঘটনাবলী তাঁর মা ও ভাইবোনেরা যত বলতে পারবেন, আর কেউ সেভাবে বলতে পারবেন না, তবু অনেক পাঠক শ্রীপ্রীতিকুমারের চিঠিগুলি পড়ে আনন্দবোধ করেছেন ও আমাকে উৎসাহিত করেছেন লিখতে।

সাহিত্য আলোচনা করতে আমি সাহস পাইনা। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য যতটা পড়া দরকার ততটাই পড়েছি, আবার যথাসময়ে ভুলে গেছি। আমি কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের রচনাংশ আবৃত্তি করতে পারিনা, বাস্তব-বোধহীন তাত্ত্বিকতায় নিরুদ্বেগে ডুবে থাকতে পারি না। লেখায় ভুলত্রুটি আমার থাকবেই। পাঠকবর্গ সেগুলি শুধরে দেবেন সময়মত, এটাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মমাস এই ফাল্গুন। এই বছর তাঁর বাষট্টি বছর পূর্ণ হতো। কারো কাছে প্রকৃত বয়স বলতে খুব দ্বিধাবোধ করতেন। 'বয়সে অনেক বড়' এমন একটি ভাব নিয়ে থাকতেন। পাড়ার ছেলেরা তাঁকে 'দাদু' বলেই ডাকতো। প্রথম প্রথম আমার খুব অসুবিধে হতো। পরে সেটা সয়ে গেছিল।

আমার জীবনের প্রথম চাকরী বাতানল কো-এডুকেশন হাই স্কুলে। সকাল ৭টায় রওনা হয়ে রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছেছিলাম, এমন ছিল যাতায়াতের ব্যবস্থা। ট্রেন, বাস, রিক্সা সাইকেল, ট্যাক্সি, গরুরগাড়ি, সবেতেই চড়তে হয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

তারকেশ্বর ষ্টেশনে বসে আছি। এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" শ্রীপ্রীতিকুমার উত্তর দিলেন, "কলকাতা।"
প্রঃ – "যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"
উঃ – "বাতানল।"
প্রঃ – "সঙ্গে কি মহাশয়ের কন্যা?"
উঃ – "আজ্ঞে না। স্ত্রী। প্রথম পক্ষের।"

একত্রিশ বছর আগেই এই অবস্থা ছিল। রাস্তায় আমার সাথে দেখা হলেও কথা বলতেন না অন্ততঃ ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। একবার দুজনেই এক বাসে যাচ্ছি। খুব পরিচিত এক ব্যক্তি ঐ বাসে ওঠাতে আমি শ্রীপ্রীতিকুমারকে কিছু বলি। সেদিন আমার ভাগ্যে ঘন্টাখানেক "শৃঙ্খলাবোধ" সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার সুযোগ ঘটেছিল।

একবার কাটিহার যাচ্ছি বাবার কাছে। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে জানলাগুলির গরাদ থাকতো না বেশিরভাগ ট্রেনে। কাটিহার ষ্টেশনে ট্রেন থামতে না থামতেই হুড়মুড় করে লোক ঢুকতে শুরু করলো দরজা ও জানলা দিয়ে। বাপী তখন একেবারেই দুগ্ধপোষ্য। তাকে কোলে করে আমি কিছুতেই নামতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি শ্রীপ্রীতিকুমার এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাচ্ছেন। কয়েকটি যাত্রীর আর্তনাদ শুনলাম, "এ সর্দারজী, ঠহরিয়ে।" কোথায় সর্দারজী? তিনি তখন স্ত্রীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে। সেদিন অবশ্য আমার খুব আনন্দ হয়েছিল – "ওঃ! আমার স্বামী কি বীর!"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য লড়াইতে আমি তাঁকে ছাড়িয়ে গেছি। কারণ আমাকে এখনও লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এ যে কি ভীষণ লড়াই তা আমার নিকটজনেরা জানেন। এ সংগ্রাম করার শক্তি আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছ থেকে পেয়েছি। তাছাড়া তাঁর আশীর্বাদ যে আমাদের সঙ্গে আছে তা আমি প্রতিপদে অনুভব করেছি।

তিনি বেশিদিন কলকাতায় থাকলে হাঁফিয়ে উঠতেন। প্রায়ই কোথাও যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ১৯৮৬-র নভেম্বরে কালীপুজার পর ভীষণ ভাবে তারাপীঠ যেতে চেয়েছিলেন। আমার ছুটি ছিল না – তাছাড়া আমি বুঝতে পারিনি তিনি একেবারেই ছুটি নিয়ে নেবেন। ভেবেছিলাম পরে সুযোগ সুবিধামত গেলেই হবে। সে সুযোগ আর হয়নি।

কোথাও পূজা দিতে গেলে পুরোহিত পাণ্ডা বা সেবাইতদের টাকা পয়সা দিতে কোনও রকম কার্পণ্য করতেন না। আমি অনেক রাগারাগি করেছি – কারণ আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকত সুনির্দিষ্ট টাকা কেনাকাটা ইত্যাদি করবার জন্য, অথচ পূজা দেবার জন্য কখনও টাকার অভাব হত না। এখন বুঝি আমাদের তাতে কত সুবিধা হয়েছে। পুরী, তারাপীঠ, তারকেশ্বর যে তীর্থস্থানেই গেছি – কোথাও পূজা দিতে বা থাকতে অসুবিধা হয়নি।

১৯৮৭ সালে আমি পুরী গিয়েছি, তারাপীঠ গিয়েছি। আমি আগের মতই ভালোভাবেই পূজা দিয়েছি। বাড়ীতে কোনও পূজা হলে ঠাকুর মশাইকে একশো টাকা বা তার বেশীও দিয়ে ফেলতেন। আমি যদি বলতাম – 'এতো দিলে পরে demand বেড়ে যাবে না তো?' শুনে হাসতেন। কিন্তু গত এক বছর দু'মাসে দেখেছি ঠাকুর মশাইরা কিছু দিলেই কিছু মনে করেন না। আমরাও শ্রীপ্রীতিকুমারের ইচ্ছের উপর গুরুত্ব দিই।

নিজে তিনি খুব ব্যস্তবাগীশ ছিলেন। কোথাও যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলে আমাদের খুব তাগাদা দিতেন। আমার হয়তো শাড়ীর ব্লাউজ বাছা হয়নি, বকুনি খাব, তাড়াতাড়ি বলে উঠতাম, 'পেটটা কামড়াচ্ছে।' ব্যস! গলে জল। 'যাও যাও। সব সেরে নাও। রাস্তায় আবার কি অসুবিধা হয়!'

আমার শাড়ী কেনার খুব সখ বরাবর। বাড়ীতে মাসকাবারি শাড়ীওয়ালা ছাড়াও বরানগরে 'ফেয়ার প্রাইস শপ' ছিল। তাছাড়া আমার বন্ধুরা আমাকে যেকোনো অনুষ্ঠানে শাড়ী দিত। একটি লালপাড় কাতান বেনারসী আমরা দুজনে মিলে কিনেছিলাম। কথা ছিল আমি মারা গেলে ঐ শাড়ীটা আমাকে পরানো হবে। মাকে বলতেন, 'মা, তোমার বৌ মারা গেলে কাঠের খরচ লাগবে না। ওর শাড়ী দিয়েই কাঠের কাজ হয়ে যাবে। মুখাগ্নি আমিই করব। ঐ শাড়ী দিয়েই মুখাগ্নি হবে।' এখন আমার মনে হয় সেটা কি তাঁর পরিহাস ছিল! আমি ১৯৮৬ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত জানতাম আমি আগে যাবো। কিন্তু ১৯৮৬-র আগষ্টে সীতাপুর আই হসপিটালে রাত ১২টায় ঘুম থেকে তুলে আমাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন – তাতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমাকে একা পড়ে থাকতে হবে। কারণ দুজনে একসাথে যাওয়া তো সম্ভব নয়। কলকাতায় ফিরে এসে বলেছিলাম, "কি স্বার্থপর! নিজে আর ভার বইতে পারছেনা, তাই সব আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

আমি সর্বদা ভাববাচ্যে কথা বলতাম। দীর্ঘদিন 'আপনি' সম্বোধন করেছি চিঠি লেখা ও কথা বলায়। চিঠির সম্বোধন বদলে ফেলতে পেরেছিলাম।

DO NOT COPY

কথা বলার অভ্যাসটা সম্পূর্ণভাবে বদলাতে পারিনি। আসলে শ্রীপ্রীতিকুমারের বিচরন এমন একটি স্তরে ছিল যার নাগাল পাবার যোগ্য আমি নিজেকে মনে করিনি। কোথাও যেন একটি মেনে চলবার, নিবেদন করবার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। "মাথার উপর উনি আছেন, আমার ভয় কি?"- এই ধারণার উপর নির্ভর করে চলতাম। গত এক বছরে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন মাথার উপর উনি আছেন। আমার কোথাও কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি একসূত্রে যে মালাটি গেঁথেছিলেন সেই মালাটি আমি গলায় পরে ফেলেছি। তাঁকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি।

শ্রীপ্রীতিকুমার একটি সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। নিজের ব্যথা অভিমান ব্যক্ত করতে চাইতেন না। তবু যাঁরা তাকে ভালো করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম।

বলেছিলেন – "ভালবাসলে ভগবানও ভক্তের কাছে হেরে যান।" – আমি ভালবাসছি। ভালবাসার চেষ্টা করতে করতে ভালবেসে ফেলছি। ভগবানকে ভালবাসতে চেষ্টা করছি, ভক্তকেও। তাই আমার অন্ততঃ এই নির্ভরতাটুকু এসেছে, আমার আর নূতন করে কোনও বিপদের ভয় নেই। মানব জীবনে সমস্যা থাকবে না এতো আর হয় না। এ সমস্যাগুলিতো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পরীক্ষাস্বরূপ। এতে উত্তীর্ণ হবার দায় তো আমাদেরই।

শ্রীপ্রীতিকুমারের সম্বন্ধে বলতে গেলে অল্প কথায় শেষ করা যাবেনা, বারবার আমাকে কলম ধরতে হবে। সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও বোধহয় আমার পক্ষে তাঁর মত একটি ব্যক্তির জীবনকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করে যাব, হয়তো সেটাই আমার সাধনা। *

(*এই রচনার প্রথম প্রকাশ পার্থসারথি, ২৮বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, মার্চ-১৯৮৮)

রামদাস কাঠিয়াবাবার অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য হচ্ছেন রামদাস কাঠিয়াবাবা। তাঁর শিষ্য হচ্ছেন সন্তদাস বাবাজী।

একবার কলকাতায় সন্তদাস বাবাজীর খুব জ্বর হলো। জ্বরে ভুগতে ভুগতে তাঁর মনে এরূপ চিন্তা হলো যে গুরুজী তো গাঁজা খেয়ে থাকেন। তিনি এক ছিলিম গাঁজা আনিয়ে নিজে সেজে তাঁর ভাগ দেবেন এবং তারপর তাঁর প্রসাদী গাঁজার ধোঁয়া পান করবেন। তাতেই তাঁর সেই জ্বর ও শরীরের ব্যথা সেরে যাবে। তিনি এরূপ চিন্তা করার পর বাজার থেকে গাঁজার কল্কে ও কিছু গাঁজা আনালেন। তারপর বেশ কিছুদিন ধরে গাঁজা সেজে গুরুজীকে মনে করে তাঁর পানের জন্য ঐ গাঁজার ছিলিম নিবেদন করলেন।

গাঁজা আপনা থেকে জ্বলে উঠলো। তার থেকে ধোঁয়াও বেরোতে লাগলো। কিছুক্ষণ এভাবে কাটলো। সন্তদাস বাবাজীর মনে হলো যে গুরুজী গাঁজার ধোঁয়া পান করেছেন। তখন তিনি ঐ কল্কেটি নিয়ে বাকি গাঁজার ধোঁয়া পান করলেন।

গাঁজা খাওয়া কখনো অভ্যাস ছিল না সন্তদাস বাবাজীর। বেশ ক'দিন ধরে গাঁজা খেলেন। অথচ তাঁর মনে কোন রকম বিকৃতি দেখা গেলো না। বরং গাঁজা খাওয়ার ফলে তাঁর গায়ের জ্বর ছেড়ে গেলো। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এভাবে তিনি আর একবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গাঁজা খেলেন। সেই সঙ্গে গুরুজীকেও মনে করলেন। এবারও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন্।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সন্তদাস বাবাজী গেলেন বৃন্দাবন ধামে। দেখা করলেন তাঁর গুরুজীর সঙ্গে। সেখানে বেশ কিছুদিন কাটালেন। পরে একদিন কলকাতায় ফেরবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

যেদিন তিনি কোলকাতায় ফিরবেন সেদিন কোলকাতায় যাবার আগে গুরুজী কয়েকজন ব্রজবাসীর সঙ্গে একত্রে বসে গাঁজা খাচ্ছিলেন। সেই সময় সন্তদাস বাবাজীকে ডেকে তিনি যে ছিলিমে গাঁজা খাচ্ছিলেন সেটা তাকে দিয়ে বললেন, তুমি এই প্রসাদী গাঁজার ধোঁয়া পান করো।

তাই শুনে জনৈক ব্রজবাসী প্রশ্ন করলেন রামদাস বাবাজীকে, বাবুও কি গাঁজা খায়? তখন তিনি হেসে বললেন, না, বাবু, গাঁজা খায় না। তবে জ্বর

DO NOT COPY

হলে কখনো কখনো বাবাকে মনে করে গাঁজার ভোগ দেয় আর সেই প্রসাদ গ্রহণ করে। সেই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন সন্তদাস বাবাজী। ভাবলেন, তিনি কলকাতায় থাকার সময় গুরুজীর উদ্দেশ্যে যে গাঁজার ভোগ দিতেন তা তিনি গ্রহণ করতেন। আর তিনি সুদূর বৃন্দাবন ধামে থাকলেও সেখান থেকে এই গাঁজা গ্রহণ করতেন। গুরুজীর মত মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথা স্মরণ করে সন্তদাসজীর মনে আনন্দের আর শেষ নেই।

সন্তদাস বাবাজী তখন তারাচরণ রায়চৌধুরি নামে বিখ্যাত ব্যবহারজীবি রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য সময় সময় কলকাতা শহর ছেড়ে মফঃস্বলে যেতে হতো। একসময় তিনি কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে গেলেন। সেই সময় কলকাতায় চোরের উপদ্রব শুরু হয়। তারাকিশোর তাঁর স্ত্রী ও অল্পবয়সের শ্যালককে কলকাতার বাসায় রেখে মফঃস্বলে চলে যান।

তারাকিশোরের স্ত্রী কলকাতার বাসায় দোতলায় থাকতেন বলে রাত্তিরবেলায় ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ না করেই শুতেন। কিন্তু এখন স্বামী ঘরে নেই, তার ওপর চোরের উপদ্রবের কথা শোনার পর রাত্তিরবেলায় শোবার আগে ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে শুতে লাগলেন। এমনকি রাত্তিরে নীচের তলায় নামতেও সাহস করতেন না।

তখন শীতকাল নয়। তাই ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখার দরুণ ঘরে ভীষণ গরম বোধ করতে লাগলেন তারাকিশোরের স্ত্রী। গরমের কষ্টকর আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এবং বাইরের পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা হাওয়ার আশায় তিনি স্থির করলেন তাঁর শোবার ঘরের সব জানালা-দরজা না খুলে তাদের মধ্যে একটি জানালার একটি পাল্লা অন্ততঃ খুলে রাখবেন। তাতে করে তিনি হয়তো গরমের হাত থেকে খানিকটা রেহাই পেতে পারবেন। এই আশায় বুক বেঁধে তিনি একটি জানালার একটি পাল্লা খুললেন।

যেমন তিনি জানালার পাল্লা খুললেন, অমনি তাঁর নজরে পড়লো এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য। দেখলেন, গুরু রামদাস বাবাজী জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং সহাস্য বদনে বলতে লাগলেন, 'মাই, তুম্হারা ডর কাহেকা? হাম তো তুম্হারি সঙ্গ মে সদাই রহতে হেঁ।' এই কথা বলার পর তিনি অদৃশ্য হলেন।

গুরুজীকে দেখার পর তারাকিশোরের স্ত্রীর মন থেকে চোরের ভয় তখুনি দূর হয়ে গেলো। তখন তার মন সাহসে ভরপুর হয়ে গেলো। তারপর থেকে তিনি ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা খুলে শুতে লাগলেন। পরে তারাকিশোর মফঃস্বল থেকে কলকাতায় ফিরলে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

একবার তারাকিশোরের স্ত্রী অন্নদার জ্বর হয়। সেই সময় আর দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক তাঁর বাসায় ছিলেন না। অন্নদা যে ঘরে শুতেন তার ঠিক পশ্চিম দিকে আর একটি ছোট ঘর ছিল। তার পশ্চিমের ঘরে শুতেন তারাকিশোর। তিনটি ঘরের মধ্যেকার দরজাগুলি খোলা থাকতো। সুতরাং রাতে পরস্পরের খবর নিতে কিছু অসুবিধে হতো না।

একদিন মাঝরাতে অন্নদার জ্বরের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে গা-জ্বালা ও ব্যথা দেখা দিল। কিন্তু মুখে সেই যন্ত্রনার প্রকাশ ঘটতে দিলেন না এই আশঙ্কায় যে তার ফলে হয়তো তাঁর স্বামীর ঘুমের কোনরকম ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তিনি নীরবে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলেন। ক্রমে যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। অন্নদাও সেই যন্ত্রণায় এতো কাতর হয়ে পড়লেন যে তাঁর আর কোনরকম বাহ্যিক চেতনা রইলো না।

এমন সময় গুরু রামদাসজী তাঁর সামনে প্রকাশ হলেন। তিনি পদ্মাসনে বসে অন্নদার অর্দ্ধেক শরীর নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। অচিরে অন্নদা নিজেকে সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর সম্পূর্ণ হুঁশ ফিরে এলো। তিনি ভাবলেন, একসময় গুরুজীর শ্রীচরণে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করবেন। এরূপ ভাবতে ভাবতেই গুরুজী অন্তর্ধান করলেন। তখন অন্নদার মনে আফশোসের আর শেষ রইলো না।

মহাপুরুষদের অলৌকিক লীলার কুলকিনারা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

DO NOT COPY

একবার তারাকিশোর তাঁদের দেশের বাড়ী হতে এক হাতীর ওপর চড়ে শ্বশুর বাড়ীতে যাচ্ছিলেন। হাতীর ওপর কেবল মাহুত ও তিনি ছাড়া অন্য তৃতীয় কোন আরোহী ছিলেন না। মাহুত হাতীর কাঁধের উপর আর তারাকিশোর তার পিঠের উপর বসে যাচ্ছিলেন। শ্বশুর বাড়ীর কাছাকাছি এক সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে হাতী যখন চলতে লাগল তখন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তারাকিশোর। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, মাহুত আর তাঁর মধ্যে একটা গাছের বড় শাখা রয়েছে। মাহুত নিজের মাথা ও শরীর অবনত করে হাতীর মাথার উপর শুয়ে পড়ে ঐ ডালটি অতিক্রম করেছে।

ঐ বড় ডালের চারদিকে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা আছে। তার দু'একটি তারাকিশোরের মুখের উপর এসে পড়ছে। ওদিকে হাতীও সবেগে চলেছে। এমন সময় নেই যে তারাকিশোর শরীর ও মাথা নত করে হাতীর পিঠের উপর মাহুতের মত শুয়ে পড়ে ঐ বড় ডালটি অতিক্রম করেন। এই অবস্থায় তারাকিশোর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কেবল চোখ দুটি বুঁজিয়ে রইলেন এবং ভাবলেন যে এখন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই। ঐ ডালে আহত হয়ে অবিলম্বেই মাটির উপর পড়ে যেতে হবে আর ঐ বড় ডাল হতে শিকের মত যে ছোট ছোট শাখা বেরিয়েছে তাতে ঘসা লেগে তাঁর মুখের মাংস নানা জায়গায় ছিন্ন হয়ে যাবে।

এই ভেবে তারাকিশোর অগত্যা চোখ বন্ধ করলেন। মনে মনে গুরুজীকে স্মরণ করতে লাগলেন। পরে দেখা গেলো, ঐ বড় ডাল দূরে থাকুক, ওর একটা ছোট শাখাও তারাকিশোরের শরীর স্পর্শ করলো না। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন তারাকিশোর, ঐ বড় ডালটা তাঁর পিছনে রয়েছে। হাতী ওটি পার হয়ে এসেছে।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার কিভাবে ঘটল তার কোন হদিশ খুঁজে পেলেন না তারাকিশোর। অথচ এই বড় ডালটি ভেদ না করে কোন ভাবেই একে অতিক্রম করার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ যেমন শূন্য জায়গা দিয়ে শরীর যাতায়াত করে থাকে তেমনি একে অতিক্রম করে চলে এসেছেন তারাকিশোর।

এমন অসম্ভব ব্যাপার কিভাবে সম্ভব হলো তা তারাকিশোর বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসা করতে পারলেন না। এ বিষয়ে তিনি কাউকে কিছু বললেনও না। কারণ বললে পরে তাঁরা বিশ্বাস করবেন না। মনের কথা মনেই চেপে রাখলেন।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে তারাকিশোর চলে এলেন বৃন্দাবনধামে গুরু রামদাস বাবাজীর কাছে।

রামদাসজী তাঁর প্রিয়তম শিষ্য তারাকিশোরকে দেখামাত্র আপনা থেকেই বলতে লাগলেন, বাবা! ডাল তোমার কি করতে পারে, ভগবান সর্বদা ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আছেন! তোমাকে তিনি সর্বদা রক্ষা করছেন।

গুরুজীর কথা শুনে শান্ত হলেন তারাকিশোর। এতক্ষণ ধরে তিনি যে বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করছিলেন এবং গাছের ডালের ভয়াবহ দুর্ঘটনার ব্যাপারে যেভাবে নিজেকে নিরাপদ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন এবং তা কিভাবে সম্ভব হলো তাই নিয়ে মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন জমায়েত করছিলেন এবার গুরুজীর কথা শুনে তাঁর সকল চিন্তার অবসান হলো।

এখন তিনি ভাবলেন গুরুজীর অসীম কৃপায় তিনি সে যাত্রা হতে উদ্ধার পেয়েছেন। মনে-প্রাণে সেদিন গুরুজীর প্রতি তিনি তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অভয় হচ্ছেন তারাকিশোরের গুরুভাই। একসময় তিনি জনৈক রেল কর্মচারীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতে লাগলেন। উক্ত রেল-কর্মচারীর থাকার জায়গা রেলওয়ে লাইনের কাছে এক অতি গোপন জায়গায় ছিল। সেখান থেকে গ্রাম দু-তিন ক্রোশ দূরে। কোয়ার্টারের চারদিকে জঙ্গল ও পাহাড়।

ইতিমধ্যে একসময় সঙ্গী রেল-কর্মচারীটি কাজের জন্য স্থানান্তরে গেলেন। কোয়ার্টারের চাকরটিও ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

অভয়কে একাকী থাকতে হলো রেল কোয়ার্টারে। তখন গরমকাল। কোয়ার্টারের ঘরগুলি এতো ছোট যে বাহিরের হাওয়া-বাতাস ভালভাবে ঢুকতে

পারে না। রাত্তিরে গরমকালে ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলেন না অভয়। তাই তিনি স্থির করলেন ঘরের বাইরে একটা গাছের তলায় খাটিয়া পেতে শোবেন। শুলেনও দু'এক রাত।

কিন্তু তা বেশিদূর এগোলো না। তৃতীয় দিনের মাথায় তাঁর যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। ভাবলেন নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে কোন বন্য জন্তু এসে তাঁর খাটিয়ার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

এরূপ ভেবে তিনি আতঙ্কিত চিত্তে যেমনি খাটিয়া ছেড়ে উঠতে যাবেন, অমনি দেখলেন, রামদাস কাঠিয়াবাবা তাঁর মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করছেন। তখন অভয় বাবাজীর পদধূলি নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। সেই মুহূর্তে বাবাজী অদৃশ্য হলেন।

এখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এল গুরুজীর প্রতি। তিনি ভাবলেন, আমার আর কোন ভয় নেই। আমি এখন ঘরের বাইরে গাছতলায় শুয়ে থাকলেও কোন ভয় নেই। কারণ গুরুজী আমাকে রক্ষা করছেন।

নির্ভীক চিত্তে সেদিন রাতে গাছতলায় শুয়ে রইলেন অভয়। সেদিন রাতে তাঁর সব চেয়ে ভাল সুনিদ্রা হয়েছিল।

⊠⊠

"বিত্ত নিয়ে গর্ব ক'রো না; কিংবা দারিদ্র্যের জন্য, আত্ম-ত্যাগের জন্য মানুষের প্রশংসাও আশাও ক'রো না – ও দুটি জিনিষ হল অহংকারের মোটা অথবা মিহি খাদ্য।"

শ্রীঅরবিন্দ

সম্প্রীতির নিলয় প্রীতিকুমার **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ**

প্রীতিকুমার ছিলেন অসামান্য প্রীতির নিলয়। ভালবাসা-প্রেম-স্নেহ দিয়ে ভরা অপার হৃদয়। পার্থসারথি পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে পত্রিকাকে ভিত্তি করে চিঠির মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার যোগসূত্র রচিত হয়। আমার বেশীরভাগ রচনা গীতা উপনিষদকে নিয়ে; কখনও বা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক অথবা কবিতা। এই লেখাগুলিকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করতেন এবং প্রায়শঃ প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে কিংবা ধারাবাহিক প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত পার্থসারথি পত্রিকায়। কখনও বা তিনি বিষয় নির্বাচন করে বা তাঁর কাছে আমার রচনা না থাকলে চিঠি দিয়ে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করতেন। তারপর একদিন পাহাড়ী চড়াই পথ অতিক্রম করে তিনি এলেন আমাদের আসাম-কামাখ্যাস্থ উমাচল যোগাশ্রমে অপরাহ্ন বেলায়। তখন তাঁর সঙ্গে হলো সাক্ষাত। হলো সৌহার্দ্যপূরিত পরিচয়। দেখা মাত্রই মনে হয়েছিল তিনি একজন প্রচ্ছন্ন বৈদিক সন্ন্যাসী। তাঁর দিব্য-দীর্ঘ-দৃঢ় দেহ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। ভাবসুগম্ভীর কথার আলোয় আমি হয়েছিলাম আলোকিত-পুলকিত। কথা-বার্তার সূত্রে বুঝেছিলাম তিনি কেবল পার্থসারথির সম্পাদক নন, তিনি একজন সুলেখক, বিদ্বান-পুরুষ, আত্মবিদ, ভক্ত-কামশূন্য কর্মযোগী।

কলকাতা বরানগরস্থ তাঁর আবাসে আমাকে কয়েকবার যেতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। প্রতিবারই সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের দ্বারা আমাকে আর্যোচিত বিনম্র প্রণাম করে ফল-জল প্রদান করে নিবিড় প্রেমের বন্ধনে বন্ধন করেছিলেন যা আজ স্মরণ না করে পারিনা। মানুষ মহচ্চরিত্র ও জ্ঞানী হলে কত নম্র-ধীর-ভদ্র-সমাহিত চিত্ত হন তিনি তার অনন্য উদাহরণ। আমার দু'খানা পুস্তক 'শিবানন্দ জীবনদর্শন' এবং 'ভোগদর্শন' তিনি অতি স্পর্ধাভরে তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পুস্তক দুটির মুদ্রন ও প্রকাশনার সর্ব দায়দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করে তিনি আমাকে কৃত-কৃতার্থ করার সাথে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পুর্বে তাঁর সাথে তাঁরই গৃহে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তিনি শয্যাশায়ী না হলেও বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র প্রকাশ করেন নি।

DO NOT COPY

তাঁর অসুস্থতার বিষয় জেনে বলেছিলাম আমাদের গুরুদেব স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রণীত 'যোগবলে রোগারোগ্য' গ্রন্থের নিয়ম কানুনগুলো মেনে চললে উপকার হতে পারে। তিনি হেসে বললেন, "এই দেখুন তাঁর পুস্তক। আমি যোগাসন করি। যোগাসন করা আমার অভ্যাস। কাশীতে যখন পড়তাম তখন এসব নিয়মিত করেছি।" মাঝে এসব করার সময় না থাকলেও রাজযোগের কিছু কিছু ক্রিয়া আমি অভ্যাস করি এবং যথাসাধ্য আহার্য সম্পর্কে আমি সতর্ক। আমি মিষ্টি মণ্ডা ও ফলমূল পর্যন্ত ব্যবহার করি না। তথাপি রোগ উপশমের কোন লক্ষ্মণই দেখি না।" আমি বললাম, "আপনি তো কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন আপনার পিতৃদেবের আদেশে আপনি সংসার ধর্মে ব্রতী হয়েছেন। তিনি অন্তিম সময়ে আপনাকে বলেছিলেন – "যখন কোন বিপদে-আপদে বা রোগে-শোকে কিংবা দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে পড়বে কিংবা নিজেকে অসহায় বোধ করবে তখন আমাকে স্মরণ করবে। আমি সে সব থেকে উদ্ধার করবো।" তাহলে এক্ষণে আপনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন। তাঁর অনুগ্রহে আপনি নীরোগ দেহে আরও দীর্ঘকাল নরনারায়ণের সেবা ও ঈশ্বর স্মরণ-মনন-ভজন করতে পারবেন।" তখন তিনি একটু ভেবে বললেন, "স্বামীজী! এই দেহের জন্য পিতৃদেবকে বিব্রত করতে আমার মন সায় দেয় না। তার চেয়ে নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করব। এই হবে সন্তানের কর্তব্য কর্ম। আমি তো মুক্তপুরুষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য কামনা থাকার জন্য আমার এই দেহধারণ। এখন আমার কোন কামনা বাসনা নাই। কর্মক্ষয় হলেই এই প্রবাসভূমি ত্যাগ করে স্ববাসে চলে যাবার শুভমূহুর্তের প্রতীক্ষা করছি। সেই লোক, সেই আনন্দময় পুরুষের সঙ্গে বাস করা এখানের সুখ ও আনন্দের চাইতে শত শত সহস্র সহস্র গুণ অধিক এবং ইহাই মানবের কাম্য, উহাতেই পুরষার্থতা সিদ্ধ হয়, কাজেই ...।"

এরপর আর কিছু বলার ছিল না। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনে নীরব হলাম। মনে হোল, যার যেখানে যতদিন থাকে দানাপানি, তার সেখানে ততদিন থাকে কানাকানি। আমার জন্যে এল ফল, মিষ্টি, দুধ। তারপর চলে আসার পালা।

এমন সময় তিনি বললেন, "স্বামীজী! আপনাকে আমি আর কি বলব! আপনি তো সবই জানেন। আমার সর্বদা শ্রীভগবানের একটি কথা মনে হয় –

যদৃচ্ছয়াচোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ।। গীতা ২/৩২

মুক্ত স্বর্গদ্বাররূপে উপস্থিত যাহা যদৃচ্ছায় ।
হেন যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য ও সুখের উপায় ।।

অন্তিম শয্যায় মা সারদা **প্রণব ঘোষ**

মা সারদা শেষবারের মতো জয়রামবাটী ত্যাগ করেন ১৯২০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী। পথে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন ২৭শে ফেব্রুয়ারী। কলকাতায় আসার আগে মা বেশ কিছুদিন ভুগেছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় শরৎ মহারাজের ইচ্ছানুসারে মাকে কলকাতায় আনা হয়। ভুগে ভুগে মার শরীর তখন অস্থিচর্মসার। মার ঐ চেহারা দেখে গোলাপ মা অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, "তোমরা কি মাকেই নিয়ে এলে গো? ভূতের মতো কালো! কেবল চামড়া ও হাড় ক'খানি এনে হাজির করলে গো? মার শরীর যে এতো খারাপ তা আমরা মোটেই বুঝতে পরিনি।"

পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ডাক্তার কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তেমন সুফল পাওয়া গেল না। তাই কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতিকে ডাকা হল। তাঁর চিকিৎসায় মা দিন পনেরো ভাল ছিলেন। তারপর আবার জ্বর দেখা দিলে এবং তেতো পাঁচন খেতে মার কষ্ট হওয়ায় এলোপ্যাথ ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষকে ডাকা হয়। তিনি একমাস চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল পাওয়া যায়নি। তখন চিকিৎসার ভার ন্যস্ত হয় ডাক্তার প্রাণধন বসুর উপর। ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও এক একদিন আনা হয়েছিল। ডাক্তার প্রাণধন বসু মনে করে করেছিলেন মার কালাজ্বর হয়েছে এবং তিনি সেইমত চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হল না। ফলে আবার কবিরাজী চিকিৎসা। প্রথমে চিকিৎসা করেন কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন ও কালীভূষণ সেন এবং পরে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি। তাঁর ছাত্র কবিরাজ

DO NOT COPY

রামচন্দ্র মল্লিক রোজ মাকে দেখে আসতেন এবং মার জন্য ওষুধ তৈরী করে দিতেন। কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই তেমন কিছু সুফল পাওয়া গেল না। মার দেহত্যাগের আগে শেষ তিনদিন ডাক্তার কাঞ্জিলালই মার চিকিৎসা করেছিলেন।

চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাচ্ছে না দেখে শরৎ মহারাজ শান্তি স্বস্ত্যয়নেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। মায়ের বাড়িতে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা ও কমলাত্মিকা এই পাঁচ মহাবিদ্যার অর্চনা ও পাঁচটি গ্রহ পূজা হয়। বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে শতবার চণ্ডীপাঠ হয়েছিল।

মায়ের রোজই তিন চার বার করে জ্বর আসত, জ্বর বাড়লে হুঁশ থাকত না। গরমকালে আবার গায়ে জ্বালা হত। সেবক সেবিকারা বরফে নিজেদের হাত ঠাণ্ডা করে গায়ে বুলিয়ে দিতেন। এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু মা ভক্ত সন্তানদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে দ্বিধা করতেন না। সেবক সেবিকাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করেও তিনি বহু ভক্তকে মন্ত্র দিয়েছিলেন।

ভক্ত বা সেবকদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ মার কথাবার্তায় প্রকাশ পেত। ডাক্তার কবিরাজ এলে মা তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। সেবকদের নির্দেশ দিতেন, "জল খেতে দাও, সন্দেশ দাও, আম দাও।"

কবিরাজ বাড়ি যাবার আগে কোন সেবক মার অসুখের খবর নিতে গেলে মা বলতেন, "খেয়ে যাও বেলা হবে।" কাশী থেকে কেউ এলে মা লাটু মহারাজের খবর জানতে চাইতেন। লাটু মহারাজ তখন কাশীতে কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী।

রোগ শয্যাতেও মা অন্যের সেবা নিতে কুন্ঠিত হতেন। কেউ পাখা নিয়ে বাতাস করলে মা বলতেন, "না, তোমার হাত ব্যথা করছে।" সেবক মার কথা না শুনে বাতাস করতে থাকলে মা বলতেন, "বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ কর, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।"

শেষ শয্যায় মা তিনটি আঘাত পান। বৈশাখ মাসে লাটু মহারাজ কাশীধামে দেহরক্ষা করেন এবং বলরাম বসুর পুত্র মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত রামকৃষ্ণ বসুও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই শোক সংবাদে তিনি চোখের জল সম্বরণ করতে পারেন নি। মার সেজ ভাই বরদা মামা নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। মার কাছে সে সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু মা নিজেই বললেন, "বরদা বুঝি নেই? দেখলুম রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।" সংবাদ খুলে বললে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল, তবে এবার যেন মা শোক কাটিয়ে উঠলেন। একদিন মা গোপেশ মহারাজকে বললেন, "শুনেছ, বরদা মারা গেছে।" কথায় বিন্দুমাত্র শোকের ভাব ছিল না।

ধীরে ধীরে বোঝা গেল মা যেন মায়াতীত রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। একদিন জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, 'মনে হয়, এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করবার ছিল, শেষ হয়েছে। এখন মনটা সর্বদা তাঁকে চায়, অন্য কিছু আর ভালো লাগে না। এই দেখ না, রাধুকে এত ভালবাসতুম, ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত করেছি, এখন ভাব ঠিক উল্টে গেছে। ও সামনে এলে ব্যাজার বোধ হয়, মনে হয় – ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নীচে নামাবার চেষ্টা করছে? ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য এতকাল এইসব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন, নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তারপর কি আমার থাকা সম্ভব হত?"

মা যে মায়া কাটাচ্ছেন তা ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। গৌরীমাকে মা বড় স্নেহ করতেন, এখন তাঁকে কাছে আসতে দিতে চান না। গৌরীমা রোজ গঙ্গাস্নানের পর মাকে দেখে যেতেন। একদিন তিনি আসতেই মা বললেন, "আমাকে স্পর্শ ক'রো না। রোজ কি করতে, কি দেখতে, বিরক্ত করতে আস?" গৌরীমা তো অপ্রস্তুত। তিনি সকাতরে বললেন, "মা, আপনি অসুখে পড়ে আছেন, আমাদের শান্তি নেই। সর্বদা আপনাকে দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সময় পাইনা। তাই রোজ একবার আপনার কাছে আসি।" মা বললেন, আমার কাছে এসে কি হবে? আমি আর কারও ঝামেলা সহ্য করতে পারছি না।" পরে বললেন, "যদি আস তবে আমার ঘরে ঢুকো না, ঐ দরজার বার

DO NOT COPY

থেকে দেখে যেও, আর কোন কথায় বকিও না।" এই ঘটনার পরে গৌরী মা নিয়মিত আসতেন এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। তা দেখেও কিন্তু মার মন টলল না।

শেষ পর্যন্ত মা রাধুর উপর থেকেও মন তুলে নিলেন। সেবিকা সরলা দেবীকে বললেন, "শরৎ কে বল ওদের জয়রামবাটী পাঠিয়ে দিতে।" এ কথায় যোগীনমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন মা, ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছ?" উত্তরে মা বললেন, "যোগেন, এরপর এদের সেখানে থাকতে হবে যে, হরি যাচ্ছে, ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। মন তুলে নিয়েছি, আর চাই না।" শরৎ মহারাজ সব কথা শুনে বুঝলেন, "মা যখন রাধুর উপর থেকে মন তুলে নিয়েছেন তখন আর আশা নেই। তথাপি সেবিকাকে দিয়ে রাধুর উপর মন নামিয়ে আনার জন্যে তিনি শেষ চেষ্টা করতে ত্রুটি করলেন না। কিন্তু ফল হল না। মা বুঝে শুনে স্পষ্টই বললেন, যে মন তুলে নিয়েছি, তা আর নামবে না জেনো।"

মা বারবার রাধু, নলিনীদি প্রভৃতিকে জয়রামবাটী পাঠিয়ে দেবার জন্যে বলতে লাগলেন। নলিনীদি তো বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই মার কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, "আমরা থাকলে যদি পিসীমার কষ্ট হয়, তাহলে না হয় আমরা চলে যাই। কিন্তু লোকেই বা কি বলবে? তারা ভাববে, "দেখেছ তাঁর এই অসুখ, আর এরা এই সময় ফেলে চলে এল!" শরৎ মহারাজ তখন মাকে বুঝিয়ে বললেন, "আপনার এই অসুখের সময় এদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে ওঁরা যাবে।" মা তবু বললেন, তা পাঠিয়ে দিলেই ভালো হত। তবে আমার কাছে যেন ওঁরা আর না আসে। আমার আর ওদের ছায়া দেখতেও ইচ্ছে নেই।"

একদিন রাধুর ছেলে হামা দিতে দিতে মার বুকের উপর উঠেছিল। মা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। যা যা, আর পারবিনি।" তারপর সেবককে বললেন, "একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এস। এসব আর ভালো লাগে না।" রাধুকে অবলম্বন করেই মার সদা ঊর্ধগামী মন জীব কল্যাণে নিযুক্ত ছিল। নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় রাধুর উপর থেকে মনও উঠে গেল। একদিন রাধুকে বললেন, "কুটো ছেঁড়া করে দিয়েছি। তুই আমাকে কি করবি, আমি কি মানুষ?" এরপর রাধুর সঙ্গে আর কথা হয়নি।

দেহত্যাগের এক মাস আগে মা নিজের ঘর থেকে ঠাকুরের ছবিও সরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি বুঝেছিলেন এরপর শরীর অচল হয়ে পড়বে এবং শৌচাদি কাজ ঘরেই সারতে হবে।

শরীর ত্যাগের সাতদিন আগে মা একদিন সকালে শরৎ মহারাজকে ডাকিয়ে আনেন। শরৎ মহারাজ এসে মার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মার হাতে হাত বুলাবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন এমন সময় মা তাঁর হাতখানি নিজের হাতের নীচে রেখে বললেন, "শরৎ, এরা রইল।" তারপর হাত সরিয়ে নিলেন। মহারাজও কোন মতে চোখের জল সামলে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে মার স্বভাব হয়েছে একেবারে অবোধ বালিকার মতো। রাত বারোটার সময় সরলা দেবী মাকে খাওয়াতে গেলে মা বায়না ধরলেন, "আমি খাব না। তোর এক কথা 'মা খাও আর বগলে কাঠি লাগাও'। এই অবস্থায় শরৎ মহারাজের নাম করলে মা নির্বিবাদে খেয়ে নিতেন। তাই সরলাদেবী সেদিনও মাকে বললেন, "তবে কি, মা, মহারাজকে ডাকব?" এবার কিন্তু সে কথায় কাজ হল না। মা বললেন, "ডাক শরৎকে, আমি তোর হাতে খাবো না।" শরৎ মহারাজ খবর পেয়ে উপরে এসে মার কাছে বসলেন। মা তাঁকে বললেন, "একটু হাত বুলিয়ে দাও তো বাবা।" তাঁর হাত দুখানা নিয়ে বললেন, "দেখনা বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে। খালি 'খাও খাও' এদের রব; আর জানে বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।" মাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়ে একটু পরে শরৎ মহারাজ নিজেই মাকে বললেন, "মা এখন একটু খাবেন?" মা বললেন "দাও"। মা কিন্তু সেবিকার হাতে খেতে রাজী হলেন না। মহারাজকে বললেন, "না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও; আমি ওর হাতে খাব না।" মহারাজ মাকে সামান্য একটু দুধ খাইয়ে দিয়ে

DO NOT COPY

বললেন, “মা, একটু জিরিয়ে খান।” এই মিষ্টি কথাটা শুনে মা খুব খুশী। বললেন, “এ কথাটা ওরা বলতে জানে না। তারপর মহারাজের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, যাও, বাবা, শোও গিয়ে।” মশারী ফেলে দিয়ে শরৎ মহারাজ যখন মার অনুমতি নিয়ে যাচ্ছেন তখন মা বললেন, “এস বাবা, বাছার কত কষ্ট হল।” পরের দিনও শরৎ মহারাজ মার বিছানায় বসে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নম্র মধুর কন্ঠে বলেছিলেন, “মা, ওদের মনে খুব কষ্ট হবে। ওরা আর কাঠি দেবে না। খাবার সময় হলে কে খাওয়াবে?” তারপর বরদা মহারাজকে বললেন, ফিডিং কাপে করে দাও তো বরদা, এই সময় আমিই খাইয়ে দিই।” তখন মা বললেন, “কেন, এই বরদা খাওয়াবে। দুধ নিয়ে এস, বরদা, আমি খাচ্ছি।” দুধ বেশ একটু গরম ছিল। মুখে দিয়েই মা চমকে উঠেছিলেন। পাছে শরৎ মহারাজ বা বরদা মহারাজ কিছু মনে করেন তাই বললেন, “ও কিছু না, আর সামান্য একটু ঠান্ডা করে দাও। বরদা বেশ পারবে।” বরদা মহারাজ মার সেবার ভার পাওয়ায় সরলাদেবীকে অন্য ভার দেওয়া হল। মা দেখলেন সরলাদেবী আর আগের মতো কাজ করেন না। তাঁকে ডাকিয়ে এনে মাথাটি মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “তুই আমার উপর রাগ করেছিস মা? আমি যদি কিছু বলে থাকে কিছু মনে করিসনি মা।” মার এই স্নেহে সরলাদেবীর মন ভিজে গেল। তাঁর দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি আবার আগের মতোই কাজ করতে লাগলেন।

ভক্ত অন্নপূর্নার মা কাঁদতে কাঁদতে মাকে প্রণাম করলে মা তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, “তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি? তারপর একটু থেমে বললেন, যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।”

শেষে মার হাতে পায়ে শোথ হয়েছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের মেয়েরা ও সুধীরাদেবী পালা করে সব সময় সেবা করতেন।

শেষের তিনদিন মা বড় একটা কথা বলতেন না। কেউ ডাকাডাকি করলে বিরক্ত হতেন। শেষে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্রন্দনরত সেবককে সান্ত্বনা দিয়ে শুধু বলেছিলেন, “শরৎ রইল, ভয় কি?” ১৯২০ সালের ২১শে জুলাই রাত দেড়টায় কয়েকবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন।

স্বাগত শুভ নববর্ষ ১৪২৮ **শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র**

হে নববর্ষ!
জানাই আবাহন তোমায়।
এসো তুমি নীরোগ-প্রতীক-সম
বিশ্বভূমি করো সুশীতল,
রোগ-শোক, দুঃখ-জ্বালা
বিদূরিত করো তব স্নিগ্ধ পরশে,
করোনার বিভীষিকা থেকে
মুক্ত হোক এই ধরাতল।

পুরাতন কষ্ট যত, যত শোক রোগ
তোমার কল্যাণ স্পর্শে
মুছে যাক সব দুর্ভোগ।

নবদিনে নবারুণ ধন্য হোক
তোমার ছোঁয়ায়,
তোমারে বরণ করি
পবিত্র বৈশাখ ১লায়।

সবার অন্তর তুমি
ভরে দাও হর্ষোল্লাসে
কাল-নিশি হোক অবসান
তোমার ‘মা ভৈ’ প্রকাশে।

DO NOT COPY

বাঁধিও মোরে চরণডোরে

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

কৃষ্ণচূড়ার আবীর মেখে দে রে বেঁধে রাঙা রাখি
বাঁশীর বিরহ সুরে ঝরবে যখন দুটি আঁখি ।

হৃদয়ের এই বাঁধন সে যে স্বর্গের পবিত্র মিলন
থাকবে অমর জগতের পথে প্রান্তরে
চিরতরে ধরা মাঝে স্নেহ-আলিঙ্গনে
থাকবে মায়াভরা অনুরাগ মাখি।

জীবন যাদের ছন্নছাড়া হৃদয়ের বাঁধন হারা
বাঁধবে রাখি তাদের দুষ্ট চপল স্রোতধারা।

বাঁধো রাখি বাঁধো মোরে বিধাতার চরণডোরে
সে বাঁধন থাকে যেন জীবনে মরণে
পূজিতে চিরতরে ভক্তি-অশ্রুলোরে
ছিঁড়িতে ভবের বাঁধন জন্মান্তর ঢাকি।

প্রত্যর্পণ

সুনন্দন ঘোষ

খণ্ড অবকাশে প্রেম নেই, কাব্য নেই,
ইঁট কাঠ কংক্রিটের স্তূপ।
ধরিত্রীর অভ্যন্তরে মানব সভ্যতার মানচিত্র বাড়ে, আর,
জীবিকার প্রয়োজনে বছরগুলো হারিয়ে যায় জীবনের নাগাল থেকে।
মেঘলা আকাশে লুকোচুরি খেলে অসমাপ্ত চাঁদ;
ক্ষুধায় আকীর্ণ শয্যায় কবিতার স্বল্প পরিসর।

তবুও কখন মনের অলিন্দে তুমি দাঁড়াও নীরবে!
আনুগত্য বহনের যন্ত্রনায় ক্লান্ত এই 'টিঁকে থাকা'
অলক্ষ্যে উন্নীত হয় 'জীবন সংগ্রামে।'

তোমার আয়ত দৃষ্টি
স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয় হৃদয়ের মশালে মশালে।
চেতনার নির্জ্ঞানে তুমি চিরন্তন ---
প্রেমসিক্তা জন্মভূমি।

স্থিতিপত্রে থাকুক খণ্ডিত আয়ুষ্কাল –
অবশিষ্ট প্রতিটি মূহুর্ত
সুন্দর সুন্দরতর করে দেব অববুদ্ধ সিসৃক্ষায়।
এই অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে
রাতভোর নিঃশব্দে জ্বালিয়ে
তোমার অঞ্জলিতে তুলে দেব স্বপ্নের সকাল।

আমি প্রতিশ্রুত।

DO NOT COPY